এই মৃত্যুর শেষ কোথায়?

ফরিদ আহমেদ

আবারো চট্টগ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে অগ্নিদগ্ধ এবং পদদলিত হয়ে মারা গেছে অর্ধ শতাধিকের বেশী গার্মেন্টস কর্মী যাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে এখনো পাঞ্জা লড়ছে আরো অসংখ্য অসহায় মানুষ। বাংলাদেশে এ ধরনের করুন মৃত্যু যেন রীতিমত নিয়মে পরিনত হয়েছে। কয়েকদিন পর পর দালান ধবসে অথবা আগুনে পুড়ে না হয় পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা যাবে গার্মেন্টস কর্মীরা। পত্রিকায় ছাপা হবে অঙ্গারসম বিকৃত দলিত সারিবদ্ধ লাশের ছবি। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং পত্রিকাওয়ালারা কিছুদিন হইচই করবে। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলবে কিছুদিন। তারপর আবার চলে যাবে বিসমৃতির অন্তরালে পরবর্তী অঘটন ঘটার আগ পর্যন্ত। এমনই বিসমৃতপরায়ন জাতি আমরা। না সুখের না দুঃখের কোন সমৃতিই আমরা বেশী দিন মনে রাখতে পারি না। এভাবেই চলছে সব কিছু এবং দেখে শুনে মনে হচ্ছে এভাবেই চলবে আজীবন। এর থেকে পরিত্রানের কোন উপায় খুজে বের করার সদুদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা আমাদের হর্তাকর্তাদের আছে বলেও খুব একটা মনে হয় না। অসহায় মেয়েগুলোর অসময়ের করুন মৃত্যু কর্তা ব্যক্তিদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আদৌ পৌছায় কিনা সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। না হলে একটা সভ্য দেশে কিভাবে দিনের পর দিন একই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। উন্নত কোন বিশ্বে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুধু জবাবদিহিই নয়, মামলা মোকদ্দমারও সম্মুখিন হতে হত এটা নিশ্চিত। কিন্তু আমাদের এই

© Mukto-Mona, 2006

সব সম্ভবের দেশে আর যাই হোক না কেন, কিছুসংখ্যক গুরুত্বহীন গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যুতে কাউকে যে সামান্যতম অসুবিধায়ও পড়তে হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন। কত ঘটা করেই না আমরা পালন করছি নারী দিবস। নারী স্বাধীনতা আর আর নারীর অধিকার নিয়ে কতই না হম্বি তম্বি করছি। নারীর দুঃখে কাতর হয়ে চোখের জলের প্লাবন বইয়ে দিচ্ছি সভা সমিতিতে। অথচ সামান্য একটু বেচে থাকার অধিকার দিতে পারছি না আমাদের এই অসহায় কর্মঠ মেয়েগুলোকে যাদের রক্ত ঘামে অর্জিত হচ্ছে বহু মূল্যবান বৈদেশিক মূদ্রা। সভা সেমিনারের বড় বড় গাল ভরা বুলি গুলো নিষ্ঠুর কৌতুক এবং প্রহসন হয়েই থাকছে। কোন কাজেই আসছে না নির্মম মৃত্যুর কাছে সপে দেওয়া দরিদ্র মেয়েগুলোর কাছে।

প্রতিটি অগ্নিকান্ডেই দেখা যাচ্ছে একইভাবে মৃত্যু হচ্ছে কর্মীদের। অগ্নিকান্ডের পর পরই তাড়া হুড়ো করে বের হতে যেয়ে পথ খুজে না পেয়ে ভেতরে আটকা পড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে, নতুবা হুড়ো হুড়ির মধ্যে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে। শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে পায়ের তলায় চাপা পড়ছে মূলতঃ মেয়েরাই । ফলে হতাহতের সংখ্যায় মেয়েদের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশী। যদিও আইন অনুযায়ী প্রতিটি ফ্যাক্টরিতেই ফায়ার একজিট রুট থাকার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর লোকের কোন অভাব নেই। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোও সাধু সন্ন্যাসী নয়। কাজেই বেশীরভাগ ফ্যাক্টরিতেই যে ফায়ার একজিট রুট নেই সে বিষয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদিও বা কোন কোনটায় থেকেও থাকে তবে সেগুলোরও সিড়ি এতো অপ্রশস্ত এবং নড়বড়ে যে দুর্ঘটনার সময় সত্যিকারের কোন কাজেই আসে না। তা ছাড়া বেশীর ভাগ সময়ই নিরাপত্তাজনিত কারণে দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। বিপদের সময় হয়তো চাবিই খুজে পাওয়া যায় না। ফলে অগ্নিকান্ডের সময় বের হওয়ার সুযোগ না পেয়ে শ্রমিকরা আটকা পড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়। কেউ কেউ জীবন বাচাতে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে নিচে। খুব কম সংখ্যক ফ্যাক্টরিতেই নিয়মিত ফায়ার ড্রিল করা হয়। উন্নত বিশ্বে যেখানে একটি ছোট বাচ্চাও জানে আগুন লাগলে কি করতে হয়, সেখানে আমাদের বেশিরভাগ কারখানার শ্রমিকেরই এ বিষয়ে কোন প্রাথমিক ধারণা নেই। ম্যানেজমেন্ট অগ্নিকান্ডের সময় কি করণীয় সে বিষয়ে শ্রমিকদের মূলত কোন জ্ঞানই দেয় না।

অনুন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার, অপরিকল্পিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং ফায়ার সার্ভিস কোড উপেক্ষা করার ফলে বার বার অগ্নিকান্ডে অসংখ্য প্রাণহানী হলেও সরকার কুম্ভকর্নের মতো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রমিকদের পুরোপুরি নিরাপত্তা বিধান ব্যতিরেকে মালিক পক্ষ গার্মেন্টস পরিচালনা করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু

© Mukto-Mona, 2006

আদালতের রায়কে কোন তোয়াক্কা না করেই নুন্যতম নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা নিয়েও অধিকাংশ গার্মেন্টিস চালিয়ে যাচ্ছেন এর মালিকেরা। পরিনতিতে বার বার মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে অসহায় মানুষগুলো। সরকারও রহস্যজনক ভাবে এ ব্যাপারে নির্বিকার। জনকন্ঠের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৯ ফেব্রুয়ারী যমুনা স্পিনিং মিলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৭ জন নিহত হয়। আহত হয় অর্ধশতাধিক শ্রমিক। গত বছর ২৬ অগাষ্ট সাভারের ইপিজেডস্থ কুং ক্যাং টেক্সটাইলে অগ্নিকান্ডে প্রায় ২০০ কোট টাকার ক্ষতি হয়। আহত হয় অর্ধ শতাধিক লেবারার। এর আগে ৭ জানুয়ারী সিদ্ধিরগঞ্জের সান গার্মেন্টিসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ২৮ শ্রমিক জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়। আহত হয় অর্ধ শতাধিক। মহাখালীর ডোরা গার্মেন্টিসে ২০০১ সালে আগুনে পুড়ে মারা যায় ১৬ জন। আগের বছর নরসিংদির বিসিক শিল্প নগরীর চৌধুরী নিটওয়ারে আগুনে পুড়ে এবং পদদলিত হয়ে মারা যায় ৪৮ জন। মিরপুরের সারাকা গার্মেন্টিসসহ অন্য একটি গার্মেন্টিসে অগ্নিকান্ডে মৃত্যু হয় সর্বমোট ৫১ জনের। সাংহাই গার্মেন্টিসে আগুনে পুড়ে মারা যায় ২৪ জনের। এছাড়া রহমান এ্যান্ড রহমান গার্মেন্টিসে অগ্নিকান্ডে মৃত্যু হয় ৯ জন। মৃত্যুর এই বিরাট পরিসংখ্যানই প্রমান করে এই সমস্যা কত ব্যাপক, হৃদয় বিদারক এবং কতখানি অবহেলিত।

ঢাকার রাজপথে সকালে যারা বের হন একটি দৃশ্য তাদের কাছে অতি পরিচিত। সারি বেধে পিল পিল করে হেটে যাওয়া গার্মেন্টিসে কর্মরত মেয়েরা। লাবন্যহীন, একহারা কিশোরী এবং তরুনী মেয়েগুলো স্থুল ধরনের সাজগোজ করে হাতে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে কিচির মিচির করতে করতে হেটে যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে। অন্যদের কাছে কেমন লাগে জানি না, জীবনযুদ্ধে কঠোর সংগ্রামরত এই মেয়েগুলোর প্রতি আমি সবসময়ই বুকের মধ্যে এক ধরনের বিচিত্র মমতা এবং ভালবাসা অনুভব করে এসেছি । এই বয়সে সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা যেখানে হাসি ঠাট্টা, তামাশা, আনন্দ, অভিমান আর রোমান্টিকতা নিয়ে মেতে আছে সেই একই বয়সে হতদরিদ্র পরিবারে এই মেয়েগুলো তাদের জীবনপাত করে দিচ্ছে নিষ্ঠুর সমাজে শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য। এদের কষ্ট, শ্রম, কান্না, আর রক্তের বিনিময়ে অনেকেই রুটি মাখন খেয়ে সুখের নহরে ভাসছেন। কিন্তু অসহায় মেয়েগুলোকে স্বাভাবিকভাবে বেচে থাকার নূন্যতম সুযোগটুকু দিতেও তারা নারাজ ।

যারা পাশ্চাত্য বিশ্বে থাকেন তারা জানেন ওয়ালমার্ট বা সিয়ার্সের একটা বড় অংশ জুড়েই বাংলাদেশের তৈরি কাপড় চোপড়ে বোঝাই। আমরা জেনে অথবা না জেনেই অনেক সময় কিনে নিয়ে আসি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক। সেগুলো পরে সাজ গোজ করে যাই কর্মক্ষেত্রে, অথবা বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয় স্বজনের বাসায়। গর্বে বুক ভরে যায় যখন কেউ

© Mukto-Mona, 2006

প্রশংসা করে। কিন্তু কেউই হয়তো কখনোই উপলব্ধি করি না এক একটি পোশাকের সঙ্গে লেগে রয়েছে শ্যামল দেশের কত শত সহস্র সুবিধা বঞ্চিত কিশোরী-তরুনীর দীর্ঘশ্বাস আর অব্যক্ত কান্নার অশ্রুবিন্দু অথবা অদৃশ্য রক্তের দাগ। বিদেশ বিভুইয়ের এই সব বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোও আমাদের অসহায় মেয়েদেরকে শোষনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশী হায়নাদের চেয়েও কম যায় না। বিশ্বাস করতে হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু জেনে অবাক হবেন ওয়ালমার্ট বাংলাদেশের একজন পোষাক শ্রমিকের পিছনে ঘন্টায় ব্যয় করে মাত্র ১৪ সেন্টস।

চট্টগ্রামের এই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে হয়তো আগের মতই কিছুদিন হইচই চলবে। তদন্ত কমিটিও গঠন করা হবে কারণ উদঘাটনের জন্য এবং যথারীতি তা কোনদিনই আলোর মুখ দেখবে না। আগের নিয়মেই চলে যাবে হিম ঘরে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ভুলে যাবো এই দুর্ঘটনার কথা। সবকিছুই চলবে স্বাভাবিক নিয়মে যতক্ষন না আবার প্রস্তুত হচ্ছে কিছু সংখ্যক শ্রমিক তাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য।

এই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আমরা যারা অসহায় মানুষ তাদের হয়তো করণীয় তেমন কিছুই নেই। তবে একটা জিনিস কিন্তু আমরা ঠিকই করতে পারি। আসুন আমরা ভাবি এই মেয়েগুলোর কেউ হয়তো আমাদের কারো আহ্লাদী ছোট বোন কিংবা ঠোট ফোলানো কিশোরী কন্যা। ভেবে ভেবে আসুন অন্তত দু'ফোটা চোখের জল ফেলি ভাগ্যাহত সুবিধাবঞ্চিত মেয়েগুলোর জন্য।

কে জানে, জনম দুঃখী মেয়েগুলো হয়তো এ'টুকুর জন্যেই ব্যাকুল হয়ে বসে আছে।

উইন্ডজর, অন্টারিও
farid300@gmail.com

© Mukto-Mona, 2006